4G 50% 8:26 p.m.
drive.google.com

শরীরী আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের সেতু হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কাহিনির অন্তর্নিহিত অর্থ বাংলা কথাসাহিত্যে অভূতপূর্ব। রাণুর প্রেম সমকামিতার আবিলতায় আচ্ছন্নতাজনিত কারণে তুচ্ছ তো নয়ই, বরং এ প্রেম যেন নিকষিত হেম,—দেহ ও আত্মার চরমতম মিলনের মাধুর্যে সুন্দর ও নির্মল। অন্যদিকে, দেহাত্মবাদী দর্শনে বিশেষ ব্যঞ্জনাগর্ভ বা Symbolic:

রাণু (নারী)————স্বাভাবিক প্রেম— কানু (পুরুষ)
কানু (পুরুষ)————স্বাভাবিক দাম্পত্য প্রেম—ইন্দিরা (নারী-কানুর বিবাহিত স্ত্রী)
রাণু (নারী)————স্বাভাবিক মিলন বা—ইন্দিরা (নারী)

'অরূপের রাস'

এই হল গভীর ইঙ্গিতবাহী গল্পের প্লট। এর মধ্যে চরিত্রের মনোজগতের টানাপোড়েন ব্যতীত আর কোন জটিলতা বোধ হয় নেই। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস। এ উপন্যাসের 'সূচনা' অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত, এখনো হয়।.....মনের সংসারের কারখানা ঘরে আগুনের জ্বলুনি, হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি গড়ে উঠতে থাকে।"

অনেক পরবর্তী কালের রচনা 'অরূপের রাস' পড়তে পড়তেও প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে হয় মনের সংসারের কারখানা ঘরের এই 'আগুনের জ্বলুনির' বিষয়টি। চেতনাপ্রবাহের গভীর রহস্য অনুধাবন করে রাণুর জটিল মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয়তো মেলে; তবে জীবনতৃষ্ণা যে অশেষ, অসীম, অপরিমেয়—সেই জীবনপাঠই গ্রহণ করতে হয় আমাদের। সেই জীবনতৃষ্ণার ইতিকথাই—'অরূপের রাস'।

4G 50% 8:25 p.m.
drive.google.com

> সৃষ্টির নেপথ্যে যে পাঞ্চভৌতিক শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—এ সকল যেন তাহারই ক্বচিৎ-দৃষ্ট মূর্তি।" (বর্তমান বাংলা সাহিত্য, সাহিত্য বিতান)

জগদীশ গুপ্ত মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে অত্যন্ত নগ্নভাবে দেখিয়েছেন। আর এই দেখানোটা একেবারেই আরোপিত নয়, তাঁর সাহিত্যের অন্তর্জাত প্রবণতা। মানুষ যে চরিত্র সংশোধন করতে পারে, সমাজ যে নিজেকে সংশোধিত করে পরিবর্তন সাধন করতে পারে—এ ধরনের কোন বিশ্বাস তাঁর লেখায় চোখে পড়ে না। তাঁর বিশ্বাস যে মানুষের কতগুলো লোভতৃষ্ণা সঞ্জাত বৃত্তি আছে, যা মৌলিক এবং অপরিবর্তনীয়। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের প্রতি অবিশ্বাস থেকেই তাঁর গল্পে দুঃখবাদের তীব্রতা চোখে পড়ে। সহজ বিশ্বাসের সুর অনুরণিত হয় না তাঁর লেখায়। সবমিলিয়ে তাঁর লেখা গল্পগুলো অদ্ভুত প্রকৃতির। শরৎচন্দ্র-প্রভাতকুমার মানিক-শৈলজানন্দ—এঁদের মধ্যে থেকেই তিনি নিজের মতো করে লিখে গেছেন। শরৎচন্দ্রের মতো গ্রামজীবনের কথা পেয়েছি তাঁর গল্পে। মানিকের মতো মনস্তাত্ত্বিক গল্প লিখেছেন তিনি, কিন্তু তার স্বাদ একেবারে আলাদা—মনোগহনের সর্পিল পথে তাঁর পরিক্রমা। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনগতি কতটা বক্রগতির ছিল, সে সম্পর্কে বিস্তৃত বলা না গেলেও সংক্ষেপে যেটুকু বলতে পারা যায়, তা হল খুব সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন লেখক। কুষ্টিয়া বা বোলপুরবাসী লেখক কোনো ব্যক্তিগত জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেননি। লেখকের স্ত্রী শ্রীযুক্তা চারুবালা গুপ্ত সাহিত্য রচনার প্রেরণাদাত্রী ছিলেন। 'রসচক্র' নামে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে বারোজন লেখকের একটি সাহিত্যবাসর ছিল, যার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন জগদীশ গুপ্ত।

গল্পের নামকরণ 'অরূপের রাস' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'অরূপ' শব্দের অর্থ রূপাতীত; আর 'রাস' অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণের মিলনের দিকে ইঙ্গিত করে এই মিলনের অনুষঙ্গ। রাণু ও কানুর মিলন হয়নি এ গল্পে। তাদের প্রেমাকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তই থেকে গেছে। কানুর স্ত্রী ইন্দিরার স্পর্শে রাণু চেয়েছে তার প্রেমকে পরিতৃপ্তি দিতে। এইরকম ধরনের অভিনব কাহিনি বয়ন বাংলা গল্পের ধারায় অভিনব। আজন্মকাল ব্যবহৃত হয়ে আসা নায়ক-নায়িকা কেন্দ্রিক একরঙা প্রেমের গল্প থেকে এ গল্পের স্বাদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মূল চরিত্র দুজন—কানু ও রাণু। দুজনে বাল্যকাল থেকে দুজনের সঙ্গে পরিচিত। বয়সের পার্থক্য দুজনের সাত বছর। গল্পের সূচনায় লেখক জানিয়েছেন—"সে সাত; আমি চৌদ্দো বছরের"।

সাত বছরের বড়ো হওয়ার অধিকারে কানু যখনই কোনো শাসন করার চেষ্টা করেছে রাণুকে, কোনো কাজ হয়নি; কারণ—

> "আমার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া আমার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িত; বলিত,—'কানুদা একটা বড়ো মানুষ কিনা, তাই বকতে বসেছে। হি হি হি..."

বয়ঃসন্ধিকালে রাণুর যখন দশ, কানুর সতেরো,—কানু তার সঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণ করেছিল—

> "ডান হাত দিয়া মরণোন্মুখ নেলসনকে দেখাইয়া দিলাম এবং বাঁ হাত দিয়া রাণুর কটি বেষ্টন করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।"

ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণের ব্যাপারটি অনুভব করেছে রাণু সম্পূর্ণত—

4G 50% 8:26 p.m.
drive.google.com

"কানুদা তোমার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হইবেই না, জীবনে ইহাই আমার সকল দুঃখের বড়ো দুঃখ। দুটি দিনের কথা তোমার মনে পড়ে?..... যেদিন রাগ করিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া খাবার খাও নাই, আর যেদিন তোমার প্রীতি উপহারের কাগজ আগুনে ফেলিয়া দিয়াছিলাম? কারণ কী, তুমি নিশ্চয়ই জানো না। শুধু এইটুকু জানিয়া রাখো, তোমার সে উল্লাস আমার সহ্য হয় নাই।—তুমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্রাণী; আমার প্রণাম গ্রহণ করো।

ইতি—রাণু।"

রাণুর এ চিঠি পড়ে কানুর মুগ্ধ বিস্মিত মন দিশা খুঁজে পায়নি।

বহুদিন পর সন্তানবতী রাণু বিবাহিত কানুর দেশে এল, রাণুর পূর্ণতা দেখে নিজেকে সেদিন অপূর্ণ মনে করেছে কানু। রাণু ছেলের নামকরণ করেছে 'বেণু'— বোধহয় 'কানু' নামের সঙ্গে সাদৃশ্যবশত। বেণুকে কোলে নিয়ে কানুর একটা অদ্ভুত উপলব্ধি হয়েছে; কারণ রাণুরই—

"সুনিবিড় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি এই বিগ্রহ—তাহারই প্রাণের স্পন্দন, দেহের বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত রক্ত, হৃদয়ের আনন্দরস স্থানান্তরিত হইয়া আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আছে...।"

অন্যদিকে, গল্প ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যায় যখন রাণু কানুর স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে দেহগত ভাবে একাত্ম হয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে—

"আয় বৌ, তুই আর আমি এক হয়ে যাই।"

এখানেই প্রথম Fetichism বা বস্তুকাম-এর মনোভাবটি ব্যক্ত হয়েছে। ইন্দিরার সঙ্গে শয়ন করবার পরিকল্পনার মধ্যে ইন্দিরাকে Fetish হিসেবে গ্রহণ করবার ইচ্ছাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইন্দিরার শয়নকালীন অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তিতে ইন্দিরাকে যে সে Fetish হিসেবে ব্যবহার করেছে, তার পরিচয় পাই—

"ইন্দিরা বলিল,—যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি।"

ইন্দিরার দেহে রয়েছে কানুর স্পর্শ। ইন্দিরার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করলে কানুর স্পর্শ লাভ করা যাবে এই কল্পনায় রাণু ইন্দিরার দেহকে ব্যবহার করেছে। কানু বিষয়টি স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছে এবং বিপরীতক্রমে বস্তুকাম এর তৃপ্তি সেও স্পষ্ট অনুভব করেছে। ইন্দিরা যেন একটি মাধ্যম হিসেবে উভয়ের যৌন সম্পর্ক সূত্র স্থাপন করে উভয়কে তৃপ্ত করেছে—

"ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক রক্তপূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে।....আমি তৃপ্ত।"

বাস্তবিক 'অরূপের রাস' জগদীশ গুপ্তের একেবারে নতুন সৃষ্টি,—অন্য স্বাদের রচনা। ঠিক এ ধরনের সমস্যাকে ভিত্তি করে জগদীশ গুপ্তের আর কোন গল্প পাওয়া যায়নি। গল্পের কথক কানু—উত্তম পুরুষের বয়ানে রচিত গল্পটি। তবে রাণুর জীবনতৃষ্ণা বা অমেয় জীবনবাসনাই গল্পের লক্ষ্য। ধাপে ধাপে জগদীশ গুপ্ত উন্মোচন করেছেন রাণুর জটিল

4G 50% 8:25 p.m.
drive.google.com

"চট করিয়া একবার পিছন দিকের দরজার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রাণু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল—আর কী কী ছবি আছে দেখাও।"

দশ বছরের বালিকার এই 'অকালপরিপক্কতা' কানুকে বিস্মিত করেছে। শুধু তাই নয়, বাক্য বিনিময়ের প্রতিযোগিতাতেও কানু পরাজিত। কানুর ঘরে রানু কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে—নিছক দেখা না আরো কিছু—এ প্রশ্নের উত্তরে রাণু বলেছে যে, তার উদ্দেশ্য নিছক রসগোল্লার হাঁড়ি। কিন্তু রসগোল্লা খেয়ে যায়নি রাণু—

"পরাজয়ের একটা অব্যক্ত লাঞ্ছনায় আমি নিবিয়া একেবারে অন্ধকার হইয়া গেলাম।...ব্যাপারটা নিছক কৌতুক, কিন্তু হঠাৎ বিশ্রী হইয়া গেল।"

দু'দিনের মধ্যেই এলো রাণুর বিবাহের সংবাদ। বিবাহের প্রস্তুতির পর্বে কানুর উল্লাস দেখে রানুর ক্ষোভ ব্যক্ত হয়। রাণু সম্পর্কে কানুর একটা স্থায়ী দুর্বলতা এই ইঙ্গিতে লেখক স্পষ্ট করেন। বিবাহ পূর্ব লজ্জারূপ ভাবটি দেখে কানু মুগ্ধ হলেও তার প্রতি রাণুর দুর্বলতা সে অনুভব করতে পারেনি। রাণুর অভিমানকে সে ক্রোধ বলে ভুল করেছে। বিয়ের কথা পুরোপুরি স্থিরীকৃত হলে দুর্লভদর্শন হয়ে উঠেছে রাণু। এই পর্বে কানুর অনুভব :

"কিন্তু মাঝখান হইতে আমি তাহার চক্ষুশূল হইয়া উঠিলাম কেন! .....অনেক ভাবিয়াও কারণটা ঠিক করিতে পারি নাই। .....কথা বলা একদম বন্ধ করিয়া দিয়াছে; দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়—যেন আমার সঙ্গে তাহার মুখ চিনাচিনিও নাই।.....একদিন দৈবাৎ তাহাকে হাতের কাছে পাইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলাম; তাহাতে সে হঠাৎ এমনই গর্জন করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল যে, আমি সাত তাড়াতাড়ি তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া পলাইবার পথ পাই নাই।"

পরে রাণু পূর্ণযৌবন নিয়ে উপস্থিত হলে কানু যৌন আকর্ষণ অনুভব করে। রাণুর কাছে তা অজ্ঞাত থাকে না, রাণু তাকে ভৎর্সনা করে। কানুর বহু পরিশ্রমসাধ্য প্রীতি উপহার, যা রাণুর বিবাহ উপলক্ষে রচিত হয়েছিল যে পদ্যে সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী-স্বদেশ-শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামী প্রভৃতি গুরুজন; দেবর ননদ-দাস- দাসী সমগ্র মানবজাতি এবং গৃহপালিত পশু পাখির প্রতি নারীর কর্তব্য, কিছুই বাদ পড়ে নি। সে পদ্য রাণু জ্বলন্ত উনুনে দিয়ে আগুনে পুড়িয়েছে। আসলে রাণুর বিয়ে উপলক্ষে কানুর কোনরকম উৎসাহপূর্ণ যোগদান রাণু কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। রাণুর বিবাহ হল—সানাই বাজল—রাণু শ্বশুরবাড়ি গেল। কানুও কলকাতায় চলে এসেছে বিদ্যার্জন উপলক্ষে। এরপর দৈবাৎ তাদের দেখা হয়েছে। পূর্ণ যৌবন-মধ্যাহ্নে উপনীত রাণুকে দেখে বুকে ঝড় উঠেছে কানুর ; কিন্তু রাণুর অভিমানাহত প্রত্যুত্তর :

"তুমি আমার মুখ দেখবার যোগ্য নও।"

নিঃসঙ্গ দুটি গ্রহের মতো ঘুরে ফিরেছে দুটি ভালবাসার মানুষ কানু আর রাণু। অথচ কেউ কারো কাছাকাছি বাহ্যত পৌঁছতে পারেনি। কানু প্রথম দিকে রাণুর ভালবাসা ও দুর্বলতা ঠিকমতো উপলব্ধিই করতে পারেনি। তা করতে পেরেছে রাণুর বিবাহের অনেক পরে তার লেখা চিঠির ভাষা থেকে। রাণু লিখেছে—

50% 8:26 p.m.
drive.google.com

মনস্তত্ত্ব। কানুর ভূমিকা গল্পের প্রয়োজনে যেভাবে ব্যবহার হয়েছে, তাতে অনেক সময় 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের 'শ্রীবিলাস' এর কথা মনে পড়ে। জগদীশ গুপ্ত ফ্রয়েড দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন কতটা, সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ হয়তো আছে; কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণে নতুন কিছু ভাবনার উপস্থাপনা ঘটিয়েছেন। রাণুর অবর্ণনীয় মানসিক বিবর্তনের রূপ ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া গল্পের গোটা কাঠামোকে গড়ে দিয়েছে। প্রেমের পুতুল থেকে প্রতিমা রূপ বয়নের মাধ্যমে রাণুর সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত। রাণু স্বামী সন্তান নিয়েও বাল্যপ্রেমের খাঁটি স্বর্গীয় প্রেমসৌন্দর্যের অনমনীয় বিভোরতায় তার প্রথম প্রেমিক কানুর স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে সমকামিতায় দেহসম্ভোগে প্রেমের মুক্তি চেয়েছে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'lesbianism' বাংলায় 'সমকামিতা', তা দিয়েও রাণুর অদ্ভুত ব্যবহারের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। সমকামিতা বিষয়টির মধ্যে বোধহয় থাকে অবচেতন স্বভাবে দৈহিক প্রেমের খেলা। রাণুর ক্ষেত্রে বিষয়টির মূলে কাজ করেছে বাল্যপ্রেমের অবোধ বাসনা। প্রেম সম্পর্কিত ধারণায় সম্পূর্ণ নতুন ধরনের Conception রাণুর ব্যবহারে আরোপিত। কৈশোরের প্রেম বিবাহিত জীবনেও অনড় থেকেছে রাণুর হৃদয়ে। ফলে স্বামী পুত্রসহ সংসার জীবনকে পাশে রেখে সে কানুর আসঙ্গলাভ করতে চেয়েছে সমকামিতাকে সুস্থ উপায় হিসেবে অবলম্বন করে। গল্পের শেষে রাণুর স্বামী বসন্তবাবুর বদলির খবর এলে রাণু সরাসরি কানুর কাছে প্রস্তাব রাখে—

> "তোমার বৌ আজ রাত্তিরে আমার কাছে শোবে। বৌটি বড়ো ভালো মানুষ।"

ইন্দিরা জানায়—"যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি।" আর গল্পের শেষ চরণ কানুর উক্তি—"আমি তৃপ্ত।"

এখানেই প্রতিষ্ঠিত হল প্রেমিক-প্রেমিকার গোপনতম যৌথ প্রেম-স্বীকৃতি ও চিরন্তন বন্ধনের অঙ্গীকার। এ এক বিস্ময়কর ভালোবাসা, যা সমকামিতার গণ্ডী পার হয়ে বহু দূরাতিক্রমী পথে যাত্রা করেছে—অবচেতন মনের ভালোবাসার তত্ত্বের এ এক সম্পূর্ণ নতুন পাঠ। মানবহৃদয়ের পাঠশালার এ নতুন পাঠ ফ্রয়েডীয় বা অন্যান্য যৌনতত্ত্ব ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যাকে দূরে সরিয়ে গভীরতম বাস্তব জীবনবেদ পাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি এটা ধরেওনি যে, জগদীশ গুপ্ত ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তা হলেও 'অরূপের রাস' গল্পটি ফ্রয়েডের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের তত্ত্বকে খণ্ডন করে। ফ্রয়েড 'Sex' শব্দটি অনেক ক্ষেত্রেই জীবন বা সমাজের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এখানেও 'যৌনতা' জাতীয় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বোধহয় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। 'রাস'-এই মিথটিকে কোন ধর্মীয় অনুষঙ্গে ব্যবহার করেননি, সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাধা-কৃষ্ণের মিলন সঞ্জাত অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বকে। পরকীয়া অর্থে রাণুর প্রেম—এও এক অচিন্তনীয় তত্ত্বের অঙ্গীকার; তবে নব চিন্তনে নবায়িত। নবায়িত কারণ, মাধ্যম হিসেবে ইন্দিরার ব্যবহার অভিনব। কানুর স্ত্রী ইন্দিরা—ফলে কানুর শরীরী প্রেমের ছাপ পড়েছে ইন্দিরার মধ্যে। সম্ভবত রাণু পুরুষের ভূমিকা নিয়ে ইন্দিরার কাছ থেকে কানুর শরীরকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছে। ইন্দিরা নিজের অজান্তে ['বউ বড় ভালো মানুষ'—রাণুর উক্তি] উভয়ের

4G 50% 8:25 p.m.
drive.google.com

জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে আপন কবিধর্মের উপলব্ধিভরে স্বতঃই বলেছিলেন—

"যে ব্যথা জীবনে সব ছন্দের অতীত,
আমি সে ব্যথায় ব্যথিত।" ('কবি নহি': 'নিশান্তিকা')

জগদীশ গুপ্ত কোন গূঢ়তর তত্ত্বের সমর্থন খোঁজেননি; বরং নিষ্ঠুর কালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যেন নিষ্ঠুরতর হতে চেয়েছেন, চেয়েছেন কালের মতোই নিরপেক্ষ, নিরঙ্কুশ হতে। জগদীশ গুপ্তের আদি অন্তহীন দুঃখ-অমঙ্গলের বোধ নিরেট। জীবন সম্পর্কিত যাবতীয় নীতিবোধ ও কল্যাণচেতনাকে কেবলমাত্র অস্বীকার করেই তৃপ্ত নন,—বিশ্বপ্রবাহের মূলে এক অমোঘ শক্তির অস্তিত্ব তিনি অনুভব করেছেন, যা একান্তরূপে বিনাশক, —নিষ্ঠুর এবং কদর্য। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অনিলবরণ রায় লিখেছেন—

"তিনি (জগদীশ গুপ্ত) দেখিতেছেন, ভগবান, ধর্ম, নৈতিকতা এসবই যে মিথ্যা শুধু তাহাই নহে, এ সংসারের যে বিধাতা সে এক নির্মম ক্রূর হৃদয় শয়তান। ...তিনি সর্বত্র দেখিতেছেন শুধু শয়তানী এবং তাঁহার এই অনুভূতি তাঁহার মধ্যে যে রসের সৃষ্টি করিতেছে তাহারই ভিয়ান করিয়া তিনি তাঁহার ছোটগল্পগুলিকে রচনা করিতেছেন।"

(আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ)

বিশ্বশক্তির নিষ্ঠুর স্বভাবেই তাঁর অন্ধ বিশ্বাস। অন্যদিকে, চরিত্রের অবচেতন বা নির্জ্ঞান মনের রহস্য উদ্ঘাটন জগদীশ গুপ্তের রচনার মূল লক্ষ্য। পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং সমকালবর্তী মানিক, শৈলজানন্দ প্রমুখের সাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থাকলেও মনের অচেতন বা নির্জ্ঞানের স্বরূপ বিশ্লেষণ জগদীশ গুপ্তেই প্রথম এবং প্রগাঢ়। কথাসাহিত্য রচনায় তাঁর পথটি ছিল স্বতন্ত্র। বাংলা কথাসাহিত্য জগতে তাঁর উপস্থিতিই ব্যতিক্রমী।

মনের গঠনের দিক থেকে, জগদীশ গুপ্তের বেশ খানিকটা মিল আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আলোচনায়—

"মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন সম্পূর্ণ নতুন ধারায়। এ ধারা কল্লোল এর নয়। পূর্বগামী কোনো লেখকের পরোক্ষ প্রভাব যদি তাঁর ওপর কখনো পড়ে থাকে, তাহলে দুজনের নাম অনুমান করা যায়। একজন জগদীশ গুপ্ত, অপরজন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।" (পরিচয় পত্রিকা/ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৩)

মানিকের মতোই জগদীশ গুপ্ত ও মনোবিকলনের জটিলতার মধ্যে দিয়ে জীবনরহস্য সন্ধানে প্রয়াসী। লেখক হিসেবে তিনি 'ন্যাচারালিস্ট' এবং জীবনের কোনো সম্পর্ককেই তাঁর স্বার্থবর্জিত মনে হয়নি। মোহিতলাল মজুমদারের আলোচনায় বিষয়টি ব্যাখ্যাত হয়েছে এইভাবে—

"সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের সুস্থ বুদ্ধি যে সকল ঘটনাকে কল্পনারও বিরোধী বলিয়া মনে করে, জগদীশচন্দ্র তেমন ঘটনাকেও তাঁহার গল্পে শুধু সম্ভাব্যতা নয়—এমন বাস্তবতায় মণ্ডিত করিয়াছেন যে, ইংরেজীতে যাহাকে bizarre বলে, সেই ভাব আমাদের অভিভূত করে। মনে হয়, আমরা এমন একটা বস্তুর সম্মুখীন হইয়াছি যাহা মানুষের বুদ্ধি বা জাগ্রত চৈতন্যের অগোচর,

50% 8:25 p.m.
drive.google.com

অরূপের রাস : জীবনতৃষ্ণার ইতিকথা

বিদিশা সিন্‌হা

লেখক জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) 'কল্লোল' (১৯২৩)-এর কালবর্তী এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে কল্লোলের যা মূল বৈশিষ্ট্য, তা অনেকটাই জগদীশ গুপ্তের রচনায় অভিব্যক্ত। যে কালচেতনা ও সমাজচেতনার ফসল কল্লোল, তার উৎস পূর্ববর্তী কালখণ্ডকে নতুন জীবনচরিত্র থেকে হারিয়ে ফেলার আন্তরিক প্রতিক্রিয়ার গভীরে। নবজাগরণের উত্তেজনায় ঘেরা ঔপনিবেশিকতার ফসল শহুরে শিক্ষিত বাঙালির জীবনের আমূল বনিয়াদ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল 'স্বদেশী' সমাপনের সময় (১৯১২) থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান সীমার (১৯১৮) পাড় ঘিরে। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস থেকে নির্জিত আত্ম-অবদমন, ভরসা থেকে হতাশা, প্রত্যয় থেকে সংশয়ের বেড়াজালে বন্দী হয়ে পড়া চেতনা আমূল এক বিনষ্টির বোধে মথিত হয়ে চলেছিল। জগদীশ গুপ্তের ভাবনা এবং রচনায় সেই প্রতিক্রিয়া, মানবিক আকাঙ্ক্ষার তীব্রতর গভীর থেকে নিঃসৃত অমোঘ সার্বিক বিনাশের প্রতীতি প্রকট এবং সংহততম রূপ ধরেছিল। এই বিশেষ সময়কালেরই এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব জগদীশ গুপ্ত। স্বতন্ত্র স্বাদের লেখক—শুধু স্বতন্ত্র বললে ঠিক বলা হয় না, বলতে হবে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে তিনি কিছুটা বেমানান। যে সময়ের লেখক তিনি, তখন ফ্রয়েড বাংলা সাহিত্যে বহু চর্চিত বিষয়। জগদীশ গুপ্তের রচনায় ফ্রয়েডীয় অবচেতন তত্ত্বের প্রভাব থাকলেও সেটা সচেতনভাবে আমদানি করা নয় বলেই মনে হয়। আসলে তিনি ভীষণ নৈরাশ্যবাদী, রুক্ষ কঠোর এবং তিক্ততা সম্পৃক্ত জীবনের কথাকার। জগদীশ গুপ্তের গল্পে জীবনের প্রতি অমেয় বিশ্বাস চোখে পড়ে না। লেখার সময় হিসেব করলে জগদীশ গুপ্ত প্রভাতকুমারের প্রায় সমসাময়িক কালের। তাঁর আত্মপ্রকাশ অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বা প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও পরবর্তীকালে। প্রেমেন্দ্র মিত্র-র প্রথম গল্প 'শুধু কেরানী' প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী'-র ১৩৩০, চৈত্র সংখ্যায়, প্রেমেন্দ্রর 'সংক্রান্তি' এবং অচিন্ত্যকুমারের 'গুমোট'-'কল্লোল'-এর পৃষ্ঠায় তাঁদের প্রথম প্রকাশিত দুটি গল্প; মুদ্রিত হয়েছিল শ্রাবণ ১৩৩১-এ।

পরিণত বয়সে জগদীশ গুপ্ত যখন গল্প-উপন্যাস লিখতে এলেন, তখন স্পষ্টই দেখা গেল তিনি "Philosophy of Sex বা কামতত্ত্বের বিশেষ ধার ধারেন না" (ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-চতুর্থ খণ্ড)। সমকালীন আলোচক তাঁকে 'দুঃখবাদী' বলে অভিহিত করেছিলেন (অনিলবরণ রায়—'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদী'-'বিচিত্রা'; ভাদ্র ১৩৩৬)। বস্তুত দুঃখবাদই ছিল শিল্পীর জীবনবোধের অন্তঃসত্ত্ব। মানুষের জীবনে অপ্রতিহত-অপ্রতিবিধেয় দুঃখ, তথা অশুভ পরিণামিতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল আমূল প্রোথিত। প্রসঙ্গত, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কথা মনে আসে। কবি ছিলেন কথাশিল্পীর মাত্র এক বছরের ছোট। কবিপুত্র সুনীলকান্তি অবশ্য বলেছিলেন, পিতা তার 'দুঃখবাদী' নন, দুঃখচেতনার কবি, দুঃখই মানবজীবনের পরিণাম—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেবল সেই অমোঘ, অনতিক্রম্য দুঃখের একটা কার্যকারণ সূত্র—এক ধরনের দর্শন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন কবি যতীন্দ্রনাথ। যিনি

অবতরনিকা : পুরুষতন্ত্রে নারীর 52

৪ অক্টোবর ২০০৯

'অবতরনিকা' গল্পটি ১৩৫৬ সালের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দেশভাগের দুবছরের মধ্যেই ১৯৪৯-এ নরেন্দ্র নাথ মিত্র পূর্ববাংলা থেকে আগত মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্দরমহলে প্রবেশ করে অর্থনৈতিক-নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট-বিপন্নতার একটি জ্বলন্ত বাস্তব ছবি এঁকেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ১৯৬৩-তে সত্যজিৎ রায় এই গল্পটিকে অবলম্বন করে 'মহানগর' নামে একটি চলচ্চিত্র করেন। স্বাধীনতা পরবর্তি সমাজ প্রতিক্রিয়ায় পরিবারে নারীর স্থান বদল হচ্ছে। বিভিন্ন জীবিকায় চলে যাচ্ছে মেয়েরা, যেতে বাধ্য হচ্ছে - পরিবারের প্রয়োজনে, বেঁচে থাকার তাগিদে। মেয়েদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তে স্বামী বা প্রিয় পুরুষের প্রতিক্রিয়া, নতুন ভূমিকায় গ্রহনের দ্বিধা- সংঘাতই সময়ের সবচেয়ে বড় সংকট। মধ্যবিত্ত জীবনের অনিশ্চয়তা ও নাগরিক অস্তিত্ব অর্জনের রেখাচিত্র নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অবতরনিকা'। এই গল্পের আরতি - সুব্রত সময়ের টানাপোড়েনে তৈরি হয়ে ওঠা নতুন মানুষ। 'গল্প লেখার গল্প'-এ নরেন্দ্রনাথ মিত্র বলেছেন,

"পারিবারিক গন্ডির ভিতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বার আকাঙ্খা বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। তাতে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তা জেনেও আমি আমার সীমার বাইরে যেতে পারিনি।

- যে সময় তিনি গল্প লিখছেন। এই পুনরাবৃত্তি বোধহয় অবশ্যম্ভাবী ছিল।

গল্পের শুরুটা লক্ষ্য করবার মত। গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র অসাধারন দক্ষতায় এক মধ্যবৃত্ত নাগরিক পরিবারের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের রূপরেখা তুলে ধরেছেন 'তা খেয়াল করার। আরতি যখন সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘরে ফিরছে, নেপথ্যে শাশুড়ীর অভ্যর্থনায় স্বামীর নীরব সমর্থন - 'এই বোধহয় এলেন আমাদের মহারানী। রাত আটটার সময় ঘরের লক্ষ্মীর ঘর সংসারের কথা মনে পড়ল।" - এই 'ঘরের লক্ষ্মী' ঘরের প্রয়োজনেই বাইরে বেরিয়েছে। সে নিজের ইচ্ছেয় যায় নি, স্বামী সুব্রতই পাঠিয়েছে চাকরি করতে। আরতির সংসারের প্রয়োজনে Significant হয়ে ওঠে পল্লো। কড়া নাড়ি ফেরাটা খুব Significant হয়ে ওঠে গল্পে। কড়া নেড়েই চলেছে কিন্তু কেউ দরজা খুলছে না। এখানেই তো সুন্দর একটা ইঙ্গিত যে আরতিকে জানান দিলেন গল্প - যদিও অনেক পরে স্বামী এসে দরজা খুলল আর।

তাইতেই সুব্রতর প্রথম প্রশ্ন,– 'সন্ধ্যে হয়ে গেছে দুঘন্টা আগে, কোথায় ছিলে এতক্ষন?' স্বামীর এই ব্যঙ্গাত্মক প্রশ্নে আরতি একটু হেসে বলে, 'বেড়াচ্ছিলাম লোকের ঘাড়ে।' স্বামীর এই co-operation এবং নানান প্রশ্নের কাছে বানে সুব্রত ও আরতির সম্পর্কের মধ্যে তৈরি হয়েছে জটিলতা, সমস্যা- পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর উপর পুরুষের অধিকারের স্বরূপ। ক্লান্ত আরতিকে সামান্য বিশ্রাম নিতে না দিয়ে রূঢ় কণ্ঠে সুব্রত বলেন,– 'আমার নিষেধ সত্ত্বেও কেন অফিস গেলে আজ?' আরতির পাল্টা প্রশ্ন ছোঁড়ে, 'না গেলে চলবে কি করে?' পাল্টা জবাব দেওয়া আরতির নতুন রূপ মেনে নিতে পারে না সুব্রত।

সব কিছু ঠিকমত চলছে না বলে মনে হলে সুব্রত নিজেই বলে আরতিকে চাকরি ছেড়ে দিতে,— 'কালই একটা রেজিগনেশন লেটার ছেড়ে দিও।' সুব্রতর আহত 'অহং' বোধ কোন ভাবেই মানতে পারছে না আরতির বদল, তার সম্পূর্ণতার লক্ষন। এরপর গল্পকার ফ্ল্যাশব্যাক রীতিতে গল্প ফিরে গেছে অতীতে। গল্পকার জানাচ্ছেন কি কারনে, কোন পরিস্থিতিতে আরতি চাকরিতে গিয়েছিল। যখন সুব্রতর আনা টাকায় পনের দিনও চলে না সংসার। সুব্রত বারবার আরতিকে তার বন্ধুর স্ত্রীদের চাকরি করার কথা শোনাতো

"পুরুষ হোক, মেয়ে হোক, আজকাল বসে খাওয়ার কি জো আছে কারো? চেষ্টা চরিত্র করে তুমিও যদি জোটাতে পারতে মন্দ হত না। বিশ হোক, পঁচিশ হোক, যা আনতে, তাতেই সাহায্য হত আমার।"

বদলাচ্ছে মানসিকতা, পুরুষ আর্থিক প্রয়োজনে মেনে নিচ্ছে স্ত্রীর আয়ের সহায়তা, ভেঙে যাচ্ছে খানিকটা সেই অচল সমাজের অনড় সংস্কারের পাঁচিলটা। কিছুদিন চাকরি করার পর যখন আরতির কোন কোন দিন অফিস থেকে ফিরতে দেরি হচ্ছে, কাজের চাপ বাড়ছে – অত্যন্ত বিরূপ, ক্ষুব্ধ সুব্রত। নানাভাবে আঘাত করতে লাগল আরতিকে। অফিসের কাজকে গুরুত্ব দেওয়ায় শুরু হল ক্ষোভ, অসন্তোষ।

আর্থিক অনিশ্চয়তা মধ্যবিত্ত পুরুষকে বাধ্য করছে সংস্কার ভাঙতে, অভ্যাস বদলাতে। আরতি নিজের ইচ্ছায় চাকরি করতে যায়নি, সুব্রত তাকে প্রায় বাধ্য করেছে। আরতিকেও তখন চেষ্টা করতে হয়েছে চাকরির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে, তারও তো চাকরি করার কোন মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। সুব্রতর বাবা-মাও কোন ভাবেই বাড়ির

বৌয়ের বাইরে চাকরি করা মেনে নিতে পারেনি। তখন সুব্রত প্রতিবাদ জানিয়েছে। লড়াই করেছে আবৃতির চাকরির সপক্ষে। সুব্রতর কথায় ও আচরণে বাবা-মা অসম্মান বোধ করলেও সুব্রত ছিল তার যুক্তিতে অনড়। আবৃতি অস্বাচ্ছন্দ বোধ করলেও সুব্রত সরেনি তার সিদ্ধান্ত থেকে। তার চাওয়াতেই আবৃতির চাকরি নেওয়া কিন্তু চাকরি করা স্ত্রীর স্বাধীন মানসিকতা, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা সুব্রত মানতে পারছে না। একার উপার্জনে দৈনন্দিন খরচের মুখোমুখি হতে না পারলেও পুরুষের 'অহং' আজন্মলালিত সংস্কার স্ত্রীর চাকরি, স্বাধীনতা, নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণে আঘাত পাচ্ছে। সুব্রতর মনে হয়, –

> " টাকা অবশ্য আসে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো কথা কানে আসে। ট্রাম বাসে বড় বেশি ঘোরে আবৃতি। বড় বেশি মেশে স্ত্রী পুরুষ সকলের সঙ্গে। ঘরের বউ-ঝিদের পক্ষে এতটা স্বাধীনতা কি ভালো! "

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গল্পের শুরুতে সুব্রতর বাবা প্রিয়গোপালের একটি মন্তব্য, –

> " এত রাত্রি অবধি কোন গৃহস্থের বউ বাইরে থাকে। এমন যে হবে, আমি আগেই জানি। আস্তাবলের ঘোড়া আর ঘরের বউ ঝির রাশ যদি একবার ছেড়ে দেওয়া যায় – "

দুটি অংশ পাশাপাশি রাখলে দেখব একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে দুই প্রজন্মের দুটি পুরুষ-নারীকে দেখছে একই দৃষ্টিতে, ভাবনা সমতাও লক্ষ্য করার। শুধু পরের প্রজন্ম নিজেরই প্রয়োজনে স্ত্রীকে উপার্জনের দিকে, বাইরের জগতে এগিয়ে দিচ্ছে কিন্তু উপার্জনশীল স্ত্রীর স্বাধীন মানসিকতা, কাজের গুরুত্ব, স্বনির্ভরতা মানতে পারছে না। মনে হচ্ছে স্বামীর অধিকার ব্যাহত হচ্ছে। সেই অধিকারে আঘাত লাগলেই শুরু হয় সংঘাত। প্রিয়গোপাল সাংসারিক প্রয়োজনে স্ত্রীকে চাকরিতে পাঠানোর কথা ভাবেন না, সুব্রত ভাবে। সেখানে বাবা-মার সঙ্গে সংঘাত – তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেবার কোন দায় পরবর্তী প্রজন্মের থাকে না এবং প্রয়োজনে অনিচ্ছুক স্ত্রীকেও তারা বাধ্য করে কিন্তু অধিকারে ঘা লাগলে চিন্তা তখন আগের প্রজন্মের থেকে খুব বেশি আলাদা হয় না। তখন দুটি প্রজন্ম এসে দাঁড়ায় একই সারিতে মনুর যথার্থ উত্তরাধিকার নিয়ে।

সুব্রত ভাবে যেভাবেই হোক আরতিকে চাকরি ছাড়াতেই হবে। তখন চরম কিছু করার কথা ভাবে সুব্রত – "তোমার হয় চাকরি ছাড়তে হবে, নয় আমাকে। চাকরি যদি করতে হয়, অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা কর।" আরতির বাবাকেও খবর দেয়। বাসায় এনে শ্বশুরকে সংক্ষেপে সবই বলে সুব্রত – জানায় আরতির ব্যবহার, চালচলন অত্যন্ত আপত্তিকর। তার কথামত না চললে আরতির সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়, 'চরম কিছু করবার আগে' আরতির বাবাকে জানিয়ে রাখা সে মনে করে।

আরতি সুব্রতর সম্পর্ক ক্রমশ বদলে যেতে থাকে। কথা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু অদ্ভুত এক জেদে অফিস যাওয়া বন্ধ করে না আরতি – "একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে থাকে সুব্রত আর আরতি। ... কিন্তু এত ঘন সান্নিধ্যে থেকেও কোন কথা হয় না।" শেষ পর্যন্ত সুব্রত আরতির বাবাকে ডেকে মেয়েকে নিয়ে যেতে বলে। এমনই গল্পের ঊর্ধ্বমুখী গতিতে হঠাৎই পতন সুব্রতর চাকরি যাওয়ার কারণে। গল্পে ঘটলো আরোহণ থেকে অবরোহণ। বদল হল সুব্রতর। সম্পর্কের টানাপোড়েন এক অন্য রূপ নিল। আরতির উপার্জনই এখন পরিবারের একমাত্র ভরসা। সুব্রত প্রতি মুহূর্তে আরতিকে সাবধান ও পরিস্থিতি বুঝে চলতে বলে। কিন্তু, পরক্ষণেই এডিসের অপমানের প্রতিবাদে চাকরি ছাড়ল আরতি। এতে অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে সুব্রত। শ্বশুর প্রিয়গোপাল কিছুই মন্তব্য করেন না। আরতির এই সিদ্ধান্তে শাশুড়ী ক্ষুব্ধ – "এমন চাকরি নেওয়াই বা কেন আর ছাড়াই বা কেন?" এদিকে সুব্রত শোনায় – "...সে হয়তো দিব্যি সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে অফিসে হাজির ...। সে তো আর সেন্টিমেন্টাল বাঙালী মেয়ে নয়।" – এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের জীবনের সবক্ষেত্রেই রয়েছে পুরুষের নিয়ন্ত্রণ।

'অবতরণিকা' অর্থাৎ সোপান – জীবনের এই ওঠা নামা আরতিকে জীবনের নির্মম সত্যের সামনে নিয়ে আসে গল্পের শেষে। একজন ঊর্ধ্বতন পুরুষ নারীত্বের কারণে অসম্মান করে অধঃস্তন কর্মচারীকে – একজন পুরুষ স্বামীত্বের অধিকার বোধে আঘাত করে সামাজিকভাবে অধিকৃত আর এক নারীকে। সে অন্য এক নারীর অসম্মানে প্রতিবাদ করেছে, ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে, তারই অপরাধে। সেই চরম মুহূর্তে গল্পের পরিণতিতে আরতির যন্ত্রণা শুধু তার একার থাকে না – পিতৃতান্ত্রিক তথা পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় সমস্ত মেয়ের অবদমন ও অবতরণের মুখবন্ধ বা উপক্রমণিকা।